গঙ্গাহৃদয়ের মানুষজন

সব্যসাচী সরকার

(দুর্দৈব পত্রিকায় অভিপ্রয়াণ সম্পাদনায় প্রকাশিত)

আফ্রিকার মাসাইমারা ও সারেঙ্গেটি পার্কে খাবারের টানে তৃণভোজী পশুদের সামূহিক অভিপ্রয়াণ দেখতে গিয়েছিলাম। রাত্রে হোটেলের তাঁবুর ক্যাম্পের বিছানায় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ভেসে এল সেই অগুনতি নু-হরিণ, 'ওয়াইল্ড বীষ্ট', নামের পশুদের অভিপ্রয়াণ। হঠাৎ সামনের এই দৃশ্য ঝাপসা হয়ে প্রচুর আলোতে সব তুষারের চাদরে ঢাকা পড়ে সেই অগুনতি পশুরা হারিয়ে গেল। দেখতে পেলাম পশুছালে আচ্ছাদিত বরফে ঢাকা এই পৃথিবীর কয়েক আদিম মানুষ হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। আকারে ইঙ্গিতে আমাকে 'তুমি কি নিজের পূর্বপুরুষদের উৎসের সন্ধানে এসেছ?', এই রকম প্রশ্নের মানে কি জিজ্ঞেস করতে তারা বলে উঠল যে আজ থেকে প্রায় ৭৫০০০ হাজার বছর আগে এখনকার মত ভয়াবহ তুষারে ঢাকা ও শৈত্য প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার আশায় তাদের একদল পূর্বপুরুষ উত্তর-পূর্ব দিশায় খাবার ও জলের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিল। বেশীর ভাগই পথের ক্লান্তি, তুষার ক্ষতে নির্জীব হয়ে ক্ষুধা- তৃষ্ণায় মারা গেলে কিছু বেঁচে ও অসফল হয়ে ফেরৎ আসে আর সে ঘটনা কিংবদন্তী হয়ে আজ আরো বেশী করে মনে করিয়ে দিচ্ছে কারন তারা এখন আর এক বার অনুরূপ অভিযানের চেষ্টা করার কথা ভাবছে। মনে মনে নিজেকেই অনুরোধ করে বসলাম যে তাদের এবারের অভিপ্রয়াণে আমায় সঙ্গে নিতে। প্রায় ১০০০ এর মত সেই আদি মানবের দলে আমি তাদের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব দিশায় এগিয়ে চললাম। ভালো লাগছিল কারন মনে হল রাস্তাটা কোনো আবছা স্মৃতির অন্তরালে টানছে। আমার মনে হল যে এ প্রায় স্যামন বা ইলিশ মাছের মত নিজের নয় আরো গভীরে আমার প্রাচীনতম বা আদিপুরুষের উৎসস্থান দর্শন করে ফিরে যাবার প্রস্তুতি। আমিও সেই পূর্বআফ্রিকার দর্শন শেষে আদিপুরুষদের বেরোনোর রাস্তাটা খুজে পেতে চাইছিলাম আর তা আমার এই তুষারাবৃত প্রায় ৭৫০০০ হাজার বছরের পটভূমিকায় জানা আছে মনে হচ্ছে তাই পথ প্রদর্শকের কাজটা আমিই করতে এগিয়ে গেলাম। উত্তর দিশায় চলতে চলতে আমার মনে পড়ল যে পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে এগোলে একেবারে ডান দিকের বিশাল

জলরাশি যা ধারে ধারে পাতলা তুষারের চাদরে ডাকা তা আমাদের দেওয়ালের মত পুব-দক্ষিন দিশায় এগোতে বাধা দিয়ে সঠিক ভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। আর বেশী উত্তর দিশায় ভয়াবহ শৈত্য প্রবাহ আমাদের পূর্ব দিশায় যেতে বাধ্য করল। এই উত্তর-পূর্ব দিশাতে দু-একটি বড় নদী তুষার ঝড়ে জমে যাওয়াতে আমাদের উষ্ণ আবহাওয়ায় খোঁজার রাস্তাটা সহজ হয়ে গেল। এবারে সেই নদী গুলি হেঁটে পেরোতে আর কোনো বাধা পেলাম না। সূর্য ওঠার দিশা আমাদের ক্রমশ সবুজ থেকে সবুজতর আর শৈত্য থেকে উষ্ণ পৃথিবীর প্রান্তে এনেদিল। এক বিশালাকার নদীর তীরে আমাদের যাত্রার প্রথম পর্ব শেষ হল। অরণ্য, মাটি আর নদীর অফুরন্ত পানীয় জল আর তার সঙ্গে উষ্ণ আবহাওয়া এদের এখানের বসতিতে সাহায্য করল। আমি তাদের বলে উঠলাম যে এখানেই থাক। প্রায় পাঁচ বছরে তারা সুন্দর বসতি করে কৃষি কার্যে সেই উর্বর নদী তীরে ফসল ফলিয়ে অবসর সময়ে কলাকৃতি পশুদের সঙ্গে নৃত্যকলার অভ্যাস ইত্যাদি আরম্ভ করে দিয়েছিল। এবার আমায় তারা প্রশ্ন করে বসল যে এটাই কি আমার দেশ আমি বলে উঠলাম তোমরা আমার পূর্বপুরুষ, কালের গতিতে আরো পূর্ব দিশায় এগিয়ে গিয়ে শষ্যশ্যামল, বনাচ্ছাদিত, নদীমাত্রিক ও সমুদ্র বেষ্টিত ভূখণ্ডে তোমাদের নিবাস। তারা বলে উঠল যে সেখানে তারা যেতে চায়। আমি তাদের বলে উঠলাম যে যেভাবে তারা সেখানে গিয়েছিল তা আমার সামনে মনে হয় স্মৃতির পটে আবার পরিদৃশ্য হবে। দক্ষিন দিশায় ভালো বসতির জন্য এক দল যাত্রা শুরু করল। তাদের বিষয়ে আমার স্মৃতিতে আর কোনো তথ্য পেলাম না। আমার পূর্বপুরুষরা আরো পূর্ব ও উত্তর দিশায় উন্নত বসতির জন্য যাত্রা করেছিল ভাবতেই দুটো দল সেদিকে যাত্রা শুরু করে দিল। আর আমি মহাকালের প্রতিভু হয়ে সবাইকে কালের স্রোতে অবলোকন করতে লাগলাম। আজ এখানে ৭০০০০ বছর আগে আমার পূর্বপুরুষদের বসতির কথা ভাবতে বসলাম। দেখতে পেলাম যে উত্তর দিশায় গতি নিয়ে ঐ নদীর তীর ধরে এগিয়ে এক বিশালকায় পর্বত মালার পাদদেশের বাঁ দিক দিয়ে তা কোনো ক্রমে পার হয়ে আরো পূর্বদিশায় দলটি যাত্রা করে এক তুষার আবৃত মালভূমির শেষ প্রান্তে এক বিশালকায় নদী পার হতে না পেরে তারা সামূহিক ভাবে সেখানেই বসতি করে নিল। অনেক যুগের অবসানে কোনোমতে নদীর (ব্রহ্মপুত্র নদ) কূল ধরে দক্ষিনে এসে তারা শেষ ১০০০০ বছরের (হলোসিন) তুষারে আবৃত অশান্ত এই নদকে শান্ত দেখে তা পার করে আরো দক্ষিনে নেমে এসেছিল। এদিকে পূর্ব দিশাতে যাত্রার দলটি জঙ্গলের কাঠ দিয়ে ভেলা করে সেই প্রথম নদীটি (সিন্ধু নদ)পার করে আর একটি শান্ত নদী (সরস্বতী) পেরিয়ে তারা আরো পূর্বে এগিয়ে গেল। এবার এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আরো পূর্ব দিশাতে (সুমাত্রা) টাবু নামে আগ্নেয়

পর্বতের ভয়ানক বিস্ফোরণ আর প্রচুর অগ্নুৎপাত সহ লাভা ও ছাই ভস্মের বর্ষণ যা প্রায় বহুবছর সূর্যের আলোর প্রবেশ বন্ধ করে দিয়ে বিস্তর প্রাণী ও বনানীর অস্তিত্বকে সেই তল্লাটে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এরা বনে জঙ্গলে বনবাসে নিজেদের আলাদা করে আজও ভারতের আদিবাসী বলে পরিচিত। এর পরের ঘটনা গুলি আমার কাছে সংক্ষেপে স্মৃতির পটে ভেসে উঠল। মনে পড়ল যে পূর্ব আফ্রিকা থেকে প্রায় ১০০০০ বছরের হিম-যুগের পর্যাবৃত্তিক বা মেয়াদী ঘটনায় পাঁচ বার আদি মানুষের বিশেষ অভিপ্রয়াণ এই ভাবেই এই উষ্ম আবহাওয়া যুক্ত নতুন প্রান্তে হয়ে এসেছে। যদিও প্রতি অভিপ্রয়াণে সংখায় কম এই মানুষ গুলির আগমন আগে আসা মানুষ জনের কাছে প্রকৃতির সম্পদের ভাগ দেওয়া নিয়ে মতান্তর ও অল্প বিস্তর যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সিন্ধু নদের উপত্যকায় ভূখণ্ডের বিশলতা তাদের সবাইকে শান্তিতে বসবাসের জায়গা করে দিয়েছিল। এই ভূখণ্ডে এই রকম বড় মাপের শেষ অভিপ্রয়াণ কিন্ত কিছু উন্নত মানবের যাদের পূর্বপুরুষ পূর্ব আফ্রিকা থেকে উত্তরে স্থিত প্রান্তে এসে আরো আগে বা পূর্ব দিকে যাবার সামর্থ্য হারিয়ে সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেছিল। অনুর্বর জমি আবার কখনো বেশ শীত ও বেশী গরম আবহাওয়া আর জল কষ্টে তারা বাঁচার তাগিদে বেশী পরিশ্রমী হয়ে বন্য জন্তুকে বিশেষ ভাবে ঘোড়ার ব্যবহারে দক্ষ হয়ে অনেক কাল পরে প্রায় শেষ ১০০০০ বছরের অভিপ্রয়াণ ঐ চিরাচরিত পথে ঘোড়া সহ এই উষ্ম আবহাওয়ার দেশে এসে প্রথম নদীতীরে (সিন্ধু) শান্তিপ্রিয় মানুষদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু করে কিছুদিন কাটিয়ে দিল। পুরানো মানুষদের অনাড়ম্বর ও শান্তিপ্রিয় জীবন যাত্রা ভাল লাগাতে এই নুতন যাযাবরের এক ভাগ সেখানেই শান্তিতে বসবাস শুরু করে দিল আর বড় দলটি আরো পূর্বে আরেক বিশালকায় কিন্তু শান্ত প্রবাহিত, সরস্বতী নদীর তীরে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিল। শিকারে অভ্যস্ত এই মানবেরা শান্তিপ্রিয় আগেকার মানুষ জনের কাছ থেকে কৃষিকার্য শিখে নিয়ে নদীর জলে চাষের ব্যবস্থা সব রপ্ত করে নিল। পরে এই উন্নত মানুষেরা শান্তিপ্রিয় আগের মানবদের সমস্ত কলা কৌশল বাড়ী তৈরীর স্থাপত্য জ্ঞান জেনে নিশ্চিন্তে জীবন যাপনের সঙ্গে বৌদ্ধিক বিষয়ে চিন্তায় রত হল। শতাব্দীর অনাবৃষ্টিতে সরস্বতী নদীটির জল কমে যাওয়াতে ঘোড়া ও সেখানের জঙ্গলে পাওয়া হাতিদের সাহায্যে নদীর উৎস মুখে কিছু বড় বড় বৃত্তাকার পাথরের খন্ডকে গুহামুখ থেকে সরিয়ে জলের ধারা বাড়াতে এক দল সাহসী ও বলশালী ব্যক্তিদের নির্দেশ ও পরিচালনা করার নায়ক, ইন্দ্র কে রাজার আসনে বসিয়ে তার আধিপত্য সবাই স্বীকার করে নিল। এরপর এরা সর্বগ্রাসী আগুন, নদীর জল, পর্বত যা পানীয় জলের উৎস, উদ্ভিদ ও বনাঞ্চল , পশুপ্রাণী যা দুগ্ধ ও ওই জাতীয় খাবার ও মাংসের যোগান দিয়ে থাকে আর বাতাসের

কাছে চির কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে নিল। তাই আগুন, জল, বাতাস, বনানী, পর্বত ও মাটিকে উৎসর্গ করে প্রথম অর্ঘ্য ইন্দ্রকে অর্পন করে নিজেরা তার প্রসাদ হিসেবে অন্ন গ্রহন করার নিয়ম করে পালন করা আরম্ভ হল। এরা গাছ গাছালির রস জারিত করে এক উত্তেজক বলবর্ধক পানীয় 'সোমরস' প্রস্তুত করে ইন্দ্র ও তার বুদ্ধিদাতা, 'বৃহস্পতি' নামের মিত্রকে অর্পন করে এটিকে তর্পন-অর্পনের প্রথা করে নিল। এরাই ইন্দ্র, বৃহস্পতি, অগ্নি, মরুৎ (বাতাস), বরুণ (বৃষ্টি), পৃথিবী, চাঁদ, সূর্যের মত শক্তিমান প্রাজ্ঞদের রচয়িতার নাম 'পরমপিতা' বা ঈশ্বর রেখেছিল। অগ্নিকুন্ডের শুদ্ধিকরনের মাধ্যমে এদের মধ্যে মানসিক ভাবে উন্নত কয়েকজন অসীম জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা শুরু করে দিয়েছিল। এই মনীষীগন সবার কাছে সম্মান অর্জন করে পুজা পাঠ, রীতি নীতির ব্যাখ্যা করে সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিতে মন দিয়েছিল। এরাই মনের ভাবকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়ে তর্পণ করেছিল এই ব্রম্ভান্ডের সৃষ্টির আদি রূপ আর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রশস্তি ও স্তুতির শ্লোকের রচনা করে। সৃষ্টি হয়েছিল আদি গ্রন্থ, "ঋকবেদ"। এদিকে প্রথম সেই (সিন্ধু নদ) নদীতীরের বাসিন্দারা এক ভয়াবহ প্লাবনে ঘর বাড়ী ছেড়ে আরও পূর্ব দিশার দ্বিতীয় নদীর (সরস্বতী নদী) দিকে বসতি করতে এগিয়ে গেলে সেখানের পূজাপাঠ রত মানুষদের সঙ্গে মারামারিতে খুব সফল না হওয়াতে জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে আরো পূর্ব দিশায় এগিয়েছিল। যারা বাধ্য হয়ে থেকে গেলেন তাদের বেদজ্ঞরা দাস বলে পরিচিতি দিলেন। আগে আসা মানুষদের এরা প্রতিদিনের নিম্নস্তরীয় কাজ কর্ম করতে বাধ্য করে কাজ বিচারে মানুষের বিভাজনের মধ্যে সর্বনিম্ন সামাজিক স্তরে রেখে দিলেন। এদের ভাগ্যের বীড়ম্বনা এই যে নুতন ভূখণ্ডে এই পুরানোরাই প্রথমে বসতি করেছিল কিন্তু শুধু মাত্র সিন্ধু নদের জল প্লাবনে ঘরছাড়া হয়ে তাদের জীবন প্রায় সেদিন থেকে আরো কষ্টের হয়ে উঠল। তাদের পরিত্যক্ত নগরগুলি আজও সিন্ধুনদ সভ্যতার স্মৃতি বহন করে আছে। যারা সরস্বতী নদী তীরের মানুষজনের দাস হয়ে থাকার ব্যবস্থায় রাজী হলনা তারা বিতাড়িত হল। এই মানুষগণ দাসের ন্যায় কাজে সাহায্য করার মানুষ গুলি থেকে ভিন্নচরিত্রের কারন বেদজ্ঞরা এদের দাস করতে অক্ষম হলেন। বেদজ্ঞ যাদের আর্য বলে পরিচিতি ও ইন্দ্র যাদের রাজা তারা এই ভিন্নচরিত্রের মানুষদের নিষাদ, নিশাচর, অসুর, রাক্ষস ও সম্মিলিত ভাবে অনার্য নামকরণ করল। আর্যরা নিজেদের সুরগণের প্রতিভু ও অনার্যদের অসুর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্বীকৃতি দিয়েছিল যে সুর ও অসুরের সৃষ্টির আদি পুরুষ এক। অনার্য নামের দলটি বনজঙ্গলের মধ্যে নিজেদের বসতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থাপিত করে এই ভূখণ্ডের একেবারে পূর্বদিশায় বিশাল দুই জল ধারার মধ্যস্থিত জায়গায় শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করে নিল। প্রায় সমকালীন

প্রথম অভিপ্রয়াণে উত্তরে এক বিশালকায় পর্বত রাশির (হিমালয়) পূর্বদিশায় গমনে এক নদী ধারায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দক্ষিন দিশায় ঘুরে সেই প্রথম অভিযানের একদল মানব এই একই বিশাল দুই নদীর মধ্যস্থিত অঞ্চলে ওই অনার্য নামীয় মানুষজনদের সঙ্গে মিশে এক অপেক্ষাতর নতুন শংকর জাতির আবির্ভাব হল যারা আমার অনেক কাছের মানুষ। এই অভিপ্রায়ন প্রায় স্তরে স্তরে বহু যুগের এবং এরা সবাই আর্য নামীয় মানুষদের বসতির বহু আগেই এই প্রান্তে বসবাস করে আসছে।

এদিকে কালের করালে সরস্বতীর জলধারা শুকিয়ে যাওয়ায় আর্যেরা সামান্য পূর্ব দিশায় অভিপ্রয়াণে সরযূ ও যমুনা নদীর মাঝে বসতি করে আর্যখ্যাত সূর্য ও চন্দ্র বংশের বীর গাথাকে মহিমান্বিত করে রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্যের রচনা করে। এ ব্যাপারে আমরা বিস্তর জানি কিন্তু যা জানা নেই তা হল এই জম্বুদ্বীপ বা ভারতনামক দেশের সৃষ্টিযজ্ঞে বঙ্গবাসীদের অস্তিত্ব ও যোগদান। সেই শংকর জাতি আর বারে বারের অভিপ্রয়ানে বনে জঙ্গলে বসবাস করে অনার্য ভাবে পরিচিত মানবদের মহামিলনে এক নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি আর তারাই আমার বা বাঙ্গালী জাতির পূর্ব পুরুষ। এদের রক্তে সুর ও অসুর, আর্য, অনার্য, হিমালয়ের মালভূমির আরেক শংকর জাতি যারা অধুনা চীন,মোঙ্গল ও প্রাচীন বার্মার সমুদ্র ও ইরাবতী নদীর তীরে বসতি সব মিলে এক উন্নত মেধাযুক্ত জাতির উদয় হল। এরা বেশি বৈদিক অনুশাসন ও সমাজ ব্যবস্থা জানত না আর সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারের চলন তেমন ছিলনা। এরা জনসাধারন ও প্রকৃতি থেকে উদ্ভুত প্রাকৃত ও পালি ভাষায় কাজ কর্ম করে যেত। আর্য অভিধানে রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধ অনার্যের হাতে সীতার লাঞ্ছনাকে কারন হিসেবে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার মহাভারতের যুদ্ধ এক আর্য গৃহবধুর লাঞ্ছনা সম্মিলিত ভাবে একদল সমগোত্রীয় আর্যের কারনে শুরু হয়েছিল। আর্যদের ভরা রাজসভায় আর্য গৃহবধুর পাশবিক লাঞ্ছনা আর অনার্য রাবণের হাতে সীতার লাঞ্ছনার তুলনা হয়না। মহাভারতে রাক্ষস মায়ের পুত্র ঘটোৎকচের অনার্য পুত্র বারবারিকের যুদ্ধ কৌশল যা এক মুহূর্তে কৌরব কুলকে ধ্বংস করার ক্ষমতা শ্রীকৃষ্ণের অবগত ছিল। তাকে কৌশলে বধ করে আর্যপুত্র অর্জুনকে মহান করার শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা যিনি তার গান্ডীবের সাহায্যে কৌরবকুলকে বধ করার সময় ২৮ দিন চেয়েছিল! আমরা অনার্য বালক একলব্যের কাহিনীও পড়েছি। আর্যদের প্রচার ব্যবস্থার জন্য আর শুধুমাত্র ভাল লেখনীর সাহায্যে তাদের নতুন ধরনের শ্লোক ও আরো বেদ, উপনিষদ, পুরাণের সৃষ্টি তাদেরকে অনার্য গোষ্ঠীর থেকে অনেক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু মানবিকতার মাপ কাটিতে অনার্য গোষ্টি অনেক বেশী সুনামের দাবীদার। শ্রীকৃষ্ণের পিসিমার ছেলেরা পান্ডব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আর

এক পিসিমার পুত্রের নাম পান্ডরিককৃষ্ণ। ইনি কৃষ্ণকে ঘৃণা করতেন ও জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। ইনিই বঙ্গ প্রদেশের রাজা ছিলেন। এই প্রথম ভারতের মধ্যে অঙ্গের সঙ্গে বঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক কাল পরে আলেকজান্ডার পোরাসকে পরাজিত করে পূর্ব দিশায় এগোনোতে বিরত হয়েছিলেন। কারন হিসেবে ইতিহাসে লেখা যে পোরাসের ৫০০ হাতী তাকে যুদ্ধে যথেষ্ট বাধা দিয়েছিল বস্তুত হাতীদের বিরুদ্ধে কোনো রনকৌশল তার জানা ছিলনা। তাই গুপ্তচর মুখের সংবাদ যে পূর্ব দিশায় মগধ সাম্রাজ্যে ৪০০০ ও তারি পূর্বে বঙ্গ নামক রাজ্যে ৬০০০ হাতি তার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে শুনে ভারত থেকে তিনি নিজের দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই আলেকজান্ডারের সময় গ্রীক ও চীন পরিব্রাজকরা মগধের পরের এই ভূখণ্ডকে "গঙ্গাহৃদয়" নামে জানত। টলেমী তার লেখায় বর্ণনা করেছেন যে এটি একটি ভূখণ্ড যা দক্ষিন দিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা আর উপরে গঙ্গা ও আরও নদী (পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র) যাদের প্রতিদিন নীল নদের মত সমুদ্রের জলোচ্ছাসের সঙ্গে জল জোয়ার-ভাটা হয়ে থাকে। এই লেখাটার বিশেষ কারন কিছু ইতিহাসকার এই নদী গুলিকে পাঞ্জাবের বলে ভুল উল্লেখ করে ছিলেন। জোয়ার-ভাটা সমুদ্র থেকে দূরে পাঞ্জাবের নদীতে হওয়া সম্ভব ছিলনা।

এর পরের ইতিহাস কমবেশি আমরা সবাই জানি। বারে বারে লুন্ঠন কারীদের দল হিমালয়ের কয়েকটি প্রচলিত পথ দিয়ে ভারতের সভ্যতার উপর আঘাত করে গেছে। কুশান সাম্রাজ্যে তক্ষশীলার অবনতি পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে হুনদের আক্রমনে তক্ষশীলার সমাপ্তির সঙ্গে সংস্কৃত ও পালি লিপি ও প্রাকৃত ভাষার এক মেটামরফিজমের কাহিনী। গুপ্ত সাম্রাজ্য তক্ষশীলার সমাপ্তির দুঃখ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনায় দূর করার চেষ্টা করে। এবারে শশাঙ্ক পৃথক ভাবে গৌড় বঙ্গের সুচনা করে গেলেন। স্থানীয় মানুষের রাজা হিসেবে পাল সাম্রাজ্যের আর্থিক অনুদানে নালন্দা ও পালেদের তৈরী বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান যা পরোক্ষ ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাতের কেন্দ্র বিন্দু হয়। সেই সময় সঠিক ভাবে বলতে ভাষার লড়াই আর জীবন যাত্রায় আর্য সভ্যতা থেকে উদ্ভুত অপ্রয়োজনীয় বিধি নিষেধের বিরোধিতার সংঘাত। এটাকে হিন্দু বৌদ্ধ সংঘাত যা ইউরোপে ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্ট্যান্টদের লড়াইের মতন মনে করা যেতে পারে। এই সময়টা সংস্কৃতকে ত্যাগ করে প্রাকৃতভাষা ও পালি লিপির হাত ধরে বাঙ্গলা ভাষার জন্মক্ষন। এর পরে দক্ষিন ভারতের অনার্য মানুষ উত্তর দিশায় উত্তরন করে সেনবংশের প্রতিষ্টা করে নবদ্বীপকে রাজধানী করে। আজকের বাঙ্গলা, আসাম, ওডিসাকে এক করে বারানসী পর্যন্ত সেনসাম্রাজ্যের বিস্তার হয়েছিল আর তারা সমুদ্র পথে যাত্রায় পারদর্শী ছিল ও শ্রীলংকায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেছিল। প্রথম বাঙ্গালী, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আচার্য হিসেবে আবির্ভাব ও তাঁর বৌদ্ধ শিক্ষা ঐ সমাজে এক বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করে। এরই সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে পালি-প্রাকৃত ও স্থানীয় কথীত শব্দ চয়নের সঙ্গে কিছু নতুন ভাষার সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলতেই থাকে। বুদ্ধের প্রচার বৈদিক ক্রিয়াকল্পের জমা আবর্জনা পরিষ্কারে ব্যবহৃত হওয়ার সঙ্গে সাধারন মানুষের ভাষার সৃষ্টি যা আর্য বা দেব ভাষার ব্যবহার সীমিত করে দিয়েছিল। এর সঙ্গে বখতিয়ার খলজীর ধ্বংসলীলা ও দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে বঙ্গ প্রদেশের সুলতানের মানসিক বিবিধতার ফসল হিসেবে তাদের সংস্কৃত ভাষার কঠিনতা থেকে প্রাকৃত ও স্থানীয় মাগ্ঘী কথিত ভাষায় রাজধর্ম পালনে তৎপর হলেন। এর ফল স্বরূপ বাঙ্গলা ভাষার রাজকীয় স্বীকৃতি। সংস্কৃত, গ্রীক, ফার্সী, পালি, প্রাকৃত ও স্থানীয় কথ্য শব্দাবলী নিয়ে এ ভাষার সৃষ্টি।

ভারতের ইতিহাসে আফ্রিকার মানুষদের পারস্য ভূখণ্ডের আগের বসতি মানুষ জনের মিশ্রণে যে উন্নত মানুষদের সরস্বতী নদীতীরে বসতি করেছিল তারা যুগ যুগ ধরে আর্য সভ্যতা ধরে রাখার চেষ্টায় বিফল হল। নিজেদের জাতিভেদে এই আলাদা করে রেখে আর নতুন রক্তের দৈন্যতায় এদের ভাবনা চিন্তায় নতুনত্বের অভাবে উচ্চস্তরীয় বৌদ্ধিক চিন্তা ধারার ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস হল।

বাঙ্গালীদের রীতি রেওয়াজ বৈদিক রীতিনীতি থেকে অনেক ক্ষেত্রে আলাদা। বিবাহের সময় সিঁদুর দান ও নোয়া পরানো দুই অপরিহার্য রীতি। এগুলো আর্য রীতির মধ্যে পড়েনা বরঞ্চ এই রীতিগুলি আমাদেরকে ভারতের প্রথম আদিবাসীদের কাছে নিয়ে আসে। তাই কবি এই সভ্যতার বাঙ্গলা ভাষায় নতুন শ্লোকের রচনা করে গেলেনঃ "এই ভারতের মহা মানবের ....."

এইসময় আমার ঘুম বেশ হালকা হয়ে গেলে কানে এল কয়েক জনের কথোপকথনে তাদের কিছু ভুলের ব্যাখ্যা যে বৃদ্ধ মানুষটিকে সাফারীতে পুরোদিন ঘোরানো উচিত হয়নি। কারণ ক্লান্তিতে আমি প্রায় একদিন বেঘোরে ঘুমিয়ে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করেছি। চোখ মেলতেই ম্যানেজার বলে উঠল, "এক কাপ কাল কফি দেব কি?" মৃদু হেসে হ্যাঁ বলে আমি ভেবে নিলাম যে আমার স্বপ্নটিকে লিখে ফেলতে হবে।